অল্প বিদ্যা ভয়ংকরী
ও
হক মীমাংসা প্রসঙ্গে

মাওলানা আবু তাহের বর্দ্ধমানী (রহ.)

অল্প বিদ্যা ভয়ংকরী
ও
হক মীমাংসা প্রসঙ্গে

লেখক
মাওলানা আবু তাহের বর্দ্ধমানী (রহ.)

প্রকাশনায়
জায়েদ লাইব্রেরী
৫৯, সিক্কাটুলী লেন, ঢাকা-১১০০।
মোবাইল : ০১১৯৮-১৮০৬১৫, ০১৭৬৮-৭৭২১৪১
E-mail : Jayed_Library@yahoo.com
abuamenah@gmail.com
website : www. JayedLibrary

http://islaminonesite.wordpress.com

অল্প বিদ্যা ভয়ংকরী ও হক মীমাংসা প্রসঙ্গে

মাওলানা আবু তাহের বর্দ্ধমানী (রহ.)

প্রকাশক: জায়েদ লাইব্রেরীর পক্ষ হতে

মুহাম্মাদ জহুরুল হক্ব জায়েদ

প্রাপ্তি স্বীকার

লেখকের পরিবার কর্তৃক অনুমতিপ্রাপ্ত

জায়েদ লাইব্রেরীর পক্ষ হতে

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০১১ ঈসায়ী

প্রথম সংস্করণ: সেপ্টেম্বর ২০১৩ ঈসায়ী

অর্থায়ন : জায়েদ লাইব্রেরীর পক্ষ হতে

মুহাম্মাদ মুজাম্মেল হক্ব

শাব্দিক সংশোধন ও পরিমার্জন

মুহাম্মাদ নুরুদ্দিন খান

এম. এম. এস, এম. এড. (প্রথম শ্রেণী)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বিনিময়: ২০/= (কুড়ি) টাকা মাত্র

http://islaminonesite.wordpress.com

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

অল্প বিদ্যা ভয়ংকরী

ঝাউডাঙ্গা সিনিয়ার মাদ্‌রাসার শিক্ষক মোঃ আইউব হোসেন নামক জনৈক মাওলানা টাইটেলধারী ব্যক্তির 'বাহাস নামা' পড়লাম। ছয় পৃষ্ঠার এই বাহাস নামায় তিনি যেভাবে মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও অবান্তর কথা লিখেছেন, সত্যিকারভাবে তা একজন মাওলানা পদবিধারী ব্যক্তির শানে বড়ই দুঃখজনক। আমি তার এই 'বাহাস নামা' সম্পর্কে দু'চারটি কথা আরজ করতে চাই। কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে এই যে, যে বিরাট পদবিধারী ব্যক্তির দু'লাইন আরবী লিখতে বা উচ্চারণ করতে সাত জায়গায় ভুল হয় তার মতো বতমিজের লেখা নিয়ে সময় নষ্ট করতে আমার ঘৃণা বোধ হচ্ছে। ভদ্রলোক লিখেছেন–

"আল-খুতবাতু আলাল মিম্বারে লি ইয়াও মিল জুমুয়াতে বিল বানজালাতে জায়েজান আমলা। ইনকানা জায়েজান যশবি আইয়ে দলিলিন? হাতু বুরহানান। আ'লা ইয়াকুনুল খুতবাতু বি-লিহানিল বানজালাতে বিদআতুন।"

এখানে আল্ খুতবাতু হবে না হালিল খুতবাতু হবে, জায়েযান হবে না জায়েযাতুন হবে; ইনকানা জায়েযান হবে না ইন-কানাত জায়েযাতান হবে; হাতু বুরহানান হবে না হাতু বুরহানাকুম হবে; আ'লা ইয়াকুনুল খুতবাতু হবে না হাল তাকুনুল খুতবাতু হবে; বিদআতুন হবে না বিদআতান হবে– এই সাধারণ জ্ঞান বা অভিজ্ঞতাটুকু যার নাই তার এই ধৃষ্টতা দেখে সত্যিই অবাক হতে হয়।

বলাবাহুল্য, ভদ্রলোকের এই আরবীটুকু যদি কোন বিশিষ্ট আরবী জাননে ওয়ালা আলেম পাঠ করেন তাহলে তিনি কখনো হাসি সম্বরণ করতে পারবেন না। তাই বলি, যার দু'চার লাইন আরবীতে এতো মারাত্মক ভুল, তার মতো একজন লোককে শিক্ষকের পদে বহাল রাখলে ছাত্রদের যে কি সর্বনাশ হতে পারে সহজেই তা অনুমান করা যেতে পারে।

আমি ভদ্রলোককে আহলে হাদীস দ্বারা পরিচালিত ঢাকার যাত্রাবাড়ী মাদ্‌রাসায় কিংবা ঢাকার পাঁচরুখি মাদ্‌রাসায় অথবা মদিনা ইউনিভার্সিটির

http://islaminonesite.wordpress.com

মঞ্জুরিপ্রাপ্ত ময়মনশাহীর চক পাঁচপাড়া জামেআ সালফিয়া মাদ্‌রাসায়, রাজশাহীর নাচোল জামেআ সালফিয়া মাদ্‌রাসায় অথবা রাজশাহীর সুলতানগঞ্জ জামেআ সালফিয়া মাদ্‌রাসায়, রাজশাহী টাউন এশাআতে ইসলাম মাদ্‌রাসায় আরও কয়েক বছর পড়াশোনা করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। তা না হলে অল্প বিদ্যা ভয়ংকরীর পরিণাম ভয়াবহ হতে বাধ্য।

ভদ্রলোক তার বাহাস নামার শিরোনামায় আহলে হাদীসদেরকে মযহাব অমান্যকারী বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু তারা আসল মযহাব অমান্যকারী না নকল মযহাব অমান্যকারী– এ কথা বলেননি।

আমি পরিষ্কারভাবে মাওলানা বিদ্যা-দিগগজকে জানিয়ে দিচ্ছি যে, আহলে হাদীসরা আসল মযহাবেই আছেন। সাহাবায়ে কেরাম যে মযহাবে ছিলেন, তাবেয়ীনে ইমাম যে মযহাবে ছিলেন, মহামতি ইমামগণ যে মযহাবে ছিলেন– আল্লাহ্‌র মেহেরবাণীতে আহলে হাদীসগণ সেই আসল মযহাবেই আছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আদেশ করেছেন : "ওয়াতা ছিমু বিহাবলিল্লাহি জামীআও ওয়ালা তাফাররাকু"– তোমরা আল্লাহর বিধানকে একযোগে মজবুত করে ধরে থাকো, খবরদার তোমরা একাধিক দলে বিভক্ত হয়ো না।

আল্লাহর এই কঠোর অর্ডিন্যান্সকে পদাঘাত করে যারা চার ভাগে বিভক্ত হয়ে মুসলিম ইউনিটিকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে, তারা যতই লম্বা পিরহান গায়ে দিয়ে, মাথায় পাগড়ি বেঁধে, যতই বড় বড় বুলি আওড়িয়ে পরহেজগারি দেখাক না কেন– আমরা তাদেরকে মুসলিম সমাজের পতনের জন্য দায়ী মনে করি। আমরা কোন রকমেই এই ভাগ-বাটোয়ারাকে সমর্থন করতে পারি না। যারা পরবর্তী যুগে এক অখণ্ড আসল মযহাবকে ভেঙ্গে চারটা নকল মযহাব সৃষ্টি করেছে, আমরা তাদের সেই নকল মযহাবগুলোকে স্বীকার করে নিতে না পারায় বড়ই গর্বিত।

ঝাউডাঙ্গা সম্মেলনে আমি আমার বক্তৃতাকে দীর্ঘ করেছিলাম। দীর্ঘ করার কারণ হলো, হানাফী আহলে হাদীস নির্বিশেষে সকল শ্রোতা আমার বক্তৃতা গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনেছিলেন। জনগণ জানেন যে, আমি মুসলিম সমাজে ফিরকা বন্দির উত্থান ও তার ভয়াবহ পরিণতির কথা বর্ণনা করেছি। জনগণ জানেন যে, আমি কুরআন ও সুন্নাহর কষ্টিপাথর দিয়ে সকল বিরোধের অবসান ঘটিয়ে মুসলিম সমাজকে এক ও অখণ্ড

http://islaminonesite.wordpress.com

জামাতভুক্ত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছি। জনগণ জানেন যে, আমি কুরআন ও সুন্নাহ পন্থীরাই আহলে হাদীস একথা প্রমাণ করেছি। জনগণ জানেন যে, সাহাবাগণ ও তায়েবীগণ আহলে হাদীস ছিলেন একথা আমি প্রমাণ করেছি। জনগণ জানেন যে, আমি ইমাম আবু হানিফা (রহঃ), ইমাম মালেক (রহঃ), ইমাম শাফেয়ী (রহঃ), ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ)– ইনারা প্রত্যেকেই যে আহলে হাদীস ছিলেন একথা তাদের উক্তি দিয়েই প্রমাণ করেছি। জনগণ জানেন যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফার (দঃ) তিরোধানের দুশো বছর পর মাযহাবী ফিরকাগুলোর সৃষ্টি হয়েছে এবং এর ফলে মুসলিম সভ্যতার কেন্দ্রস্থলগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে– একথা আমি ঐতিহাসিক প্রমাণ দিয়ে তুলে ধরেছি। আমি এ কথাও বর্ণনা করেছি যে, মযহাবী ফিরকাগুলো সৃষ্টি হওয়ার আগে মুসলিম সমাজ এক মযহাবেই ছিলেন এবং তারা সকলে আহলে হাদীস ছিলেন। জনগণ জানেন যে, আমি আমার তিন ঘণ্টা ভাষণের কোন জায়গায় মহামতি ইমাম চতুষ্টয়ের প্রতি অশালীন উক্তি প্রয়োগ করি নাই। আর কোন মযহাবের প্রতিও আমি কোন জঘন্য ভাষা প্রয়োগ করিনি। আর সেটা আমার মতো একজন মুসলমানের পক্ষে সম্ভবও নয়। বরং ইমামগণ আহলে হাদীস ছিলেন বলে সবসময় তাদের প্রতি আমি ভক্তি পোষণ করে থাকি। কিন্তু মাওলানা পদবিধারী আইউব হোসেন সাহেব কিছুসংখ্যক লোকের কাছ থেকে সস্তা বাহবা পাওয়ার মানসে মিথ্যার জাল রচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন– "মাওলানা আবু তাহের বর্দ্ধমানী তাহার দীর্ঘ বক্তৃতায় চার মযহাবের প্রতি কঠোর নিন্দাবাদ এবং ইমামগণের নামে অশোভনীয় কটূক্তি প্রকাশ করেন।" এবং উল্লেখ করেন যে, "ইজমা ও কিয়াসকে অন্ধভাবে অনুসরণ করা যাইবে না বরং অপরের রায় গ্রহণ না করিয়া নিজে নিজে জ্ঞান-গবেষণা দ্বারা হাদীস-কুরআন আমল করা উচিত।"

আমি বলবো, আমার সম্পর্কে এই উক্তি ডাহা মিথ্যা। শুধু আমি কেন, ঝাউডাঙ্গা সম্মেলনের সকল শ্রোতাই বলবেন এটা ডাহা মিথ্যা। অবশ্য মহামতি ইমামগণ প্রত্যেকেই বলে গেছেন যে, আমাদের রায় ও কিয়াসগুলোকে তোমরা কুরআন ও সুন্নাহর সাথে মিলিয়ে দেখো, যদি মিলে যায় উত্তম, আর না মিললে আমাদের রায় ও কিয়াসকে ছেড়ে দিয়ে কুরআন ও সুন্নাহর মোতাবেক আমল করো।

http://islaminonesite.wordpress.com

শ্রোতাগণ সকলেই জানেন যে, আমি ইমামগণের এই উক্তিগুলোই তুলে ধরেছি। এখন মহামতি ইমামগণের এই উক্তিগুলো যদি মহাপণ্ডিত আইউব হোসেনের অসহ্য হয়ে থাকে তো আমি করবো কি? তিনি আমার উপর যে ঝাল ঝেড়েছেন, এই ঝালটা কোথায় যেয়ে লাগছে এটা বুঝবার মতো মগজ তার থাকলে আমার মনে হয় তিনি কখনো এই কুকর্মে লিপ্ত হতেন না।

মাওলানা পদবিধারী আইউব হোসেন সাহেব সভাপতি মাওলানা মতিউর রহমান সাহেবকে নিরুত্তর করে দিয়েছেন বলে আহলাদে আটখানা হয়ে গেছেন। আমি বলবো, শুধু নিরুত্তর কেন, আপনি তাকে হতভম্ব করে দিয়েছেন। কেন তা জানেন? যখনই আপনি আপনার ঐ দু'লাইন স্বদেশী আরবী তাঁর সামনে পেশ করেছেন, অমনি তিনি অবাক হয়ে গেছেন। সভাপতি যদি গভীর জ্ঞানসম্পন্ন ও দূরদর্শী না হতেন এবং আপনার ইজ্জতের কথা চিন্তা না করতেন তাহলে তিনি হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গেই দিতেন। কিন্তু আপনার ভাগ্য ভাল যে, তিনি আপনার ঐ বিলাতী কায়দায় স্বদেশী আরবীর অপার মহিমার গোপনীয়তা রক্ষা করেছিলেন। আমরা এতো নিকটে ছিলাম তবু আমাদেরকে তিনি টের পেতে দেননি।

আপনি মাওলানা মতিউর রহমান সাহেবের অগাধ পাণ্ডিত্য ও তাঁর জ্ঞানের গভীরতা সম্পর্কে কিছু জানেন কি? জানলে এতো আস্ফালন করতেন না। আমি অনুরোধ করছি আপনি তাকে জানবার ও বুঝবার চেষ্টা করুন। আপনি কি একথা মোটেই জানেন না যে, তিনি কানে মোটেই শুনতে পান না, তবু আপনি তার নিকট চিৎকার করে কি যেন জিজ্ঞেস করেছিলেন। কিন্তু কেন বলুন তো? এতে কি আপনার শয়তানি ও ধৃষ্টতা প্রকাশ পায়নি মনে করেছেন?

আপনি জুমআর দিনে মেম্বরে দাঁড়িয়ে বাংলা ভাষায় খুতবা প্রদান করা জায়েয কিনা জানতে চেয়েছেন। শুনুন মুসলিম শরীফের হাদীসে। হযরত জাব্বের বিন সামুরাহ থেকে বর্ণিত আছে– কানাত লিন নবীয়ে ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম খুতবাতানে ইয়াজ লিছ বায়নাহুমা ইয়াক রাউল কুরআনা ওয়া ইয়োজাক্কিরুণ নাছ। আল্লাহর নবী (দঃ) দুই খুতবা প্রদান করতেন, দুই খুতবার মাঝে বসতেন। খুতবায়ে তিনি কুরআন পাঠ করতেন এবং লোকদেরকে নসিহত শুনাতেন।

http://islaminonesite.wordpress.com

জেনে রাখুন, আমরা আহলে হাদীস। এই হাদীসের উপর আমল করে থাকি। কুরআনের আয়াত পাঠ করে তার ব্যাখ্যা আমরা শুনিয়ে থাকি। কোন্ ভাষায় শুনাতে হবে– ইয়োজাক ক্বিরুণ নাছ শব্দের দ্বারা তার কোন বিধি নিষেধ বুঝায় না। অতএব বাংলা ভাষাভাষি এলাকায় কুরআন পাঠ করে তার ব্যাখ্যা বাংলা ভাষায় প্রদান করাই ঠিক। এটা কোন কিয়াস নয়। এখন যদি নিষিদ্ধতার কোন মর্ফু হাদীস আপনার জানা যাকে তাহলে অতি সত্বর সেটা প্রকাশ করে দিতে পারলে ভাল হয়।

আপনি টাকার যাকাতের ব্যাপারটাকে নিয়ে বড় ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। আপনি পরিষ্কারভাবে আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি যে আহলে হাদীসগণ হাদীস মোতাবেক যাকাত দিয়ে থাকেন। তিরমিযী ও আবু দাউদে আছে আল্লাহর রসূল (দঃ) বলেছেন : 'মিন কুল্লি আরবায়ীনা দিরহামান দিরহামুন... ফাইযা কানাত মিয়াতার দিরহামিন ফাফিহা থামছাতু দারাহিমা। প্রত্যেক চল্লিশ দিরহামে এক দিরহাম এভাবে দুশো দিরহামে পাঁচ দিরহাম যাকাত দিতে হবে। দিরহাম হলো একটি মুদ্রা, মুদ্রার নাম যদি পাল্টে যায় তবু সেটা মুদ্রাই থাকে। আরবের মুদ্রার নাম হয়েছে এখন 'রিয়াল', লন্ডনের মুদ্রার নাম হয়েছে পাউন্ড, আমাদের দেশের মুদ্রার নাম হয়েছে টাকা। যে দেশে মুদ্রা যে নামেই অভিহিত হোক না কেন হাদীস অনুযায়ী চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিতেই হবে। এটা কিয়াস নয়।

আপনি ঠিকা নিকার কথা টেনে এনেছেন। আমি বলতে চাই আপনি কি কোন আহলে হাদীসকে ঠিকা নিকাহ করতে দেখেছেন। নিশ্চয়ই দেখননি আর কোনদিন দেখবেনও না। তবে শুনুন, আপনার যদি খাহেশ হয়ে থাকে তাহলে বাপ-বেটা, চাচা-ভাতিজা, শ্বশুর-জামাই, উস্তাদ-সাগরেদ সবাই মিলে ঘরে ঘরেই আপনারা এজমা করে নিতে পারেন। ঠ্যাকায় ক্যাডা।

আপনি দুই হাতে মুসাফার যে হাদীসের কথা বলেছেন সেটা দু'হাতে মুসাফার আদৌ দলিল নয়। ওটা হলো এক হাতকে দু'হাত দিয়ে চেপে ধরে তালিম দেওয়ার কথা। আপনি কোথাকার কথা কোথায় এনে বাজীমাৎ করতে চাচ্ছেন? আর ক্ষণিকের জন্য যদি মেনে নেয়া হয় যে ওটা মুসাফার দলিল, তাহলে একজনের এক হাত আর অন্যজনের দু'হাত মোট তিন হাতের মধ্যেই ব্যাপারটা সীমাবদ্ধ থেকে যায়। তাহলে আপনার ঐ বড় মহব্বতের চার হাতের কারবারটার দলিল কোথায় পেলেন? এজমা ও কিয়াসের জোরে তিন হাত কি চার হাতে পরিণত হয়ে গেল?

http://islaminonesite.wordpress.com

আপনি বেশ কয়েকটি প্রশ্ন তুলে ধরেছেন এবং এগুলোর দ্বারা এজমা ও কিয়াসকে সাব্যস্ত করতে চেয়েছেন। আমি বলি শুনুন এজমা ও কিয়াসের অস্তিত্বকে আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু এজমা ও কিয়াস স্বতন্ত্র ও স্বাধীন দলিল নয়। কুরআন-সুন্নাহ হলো স্বতন্ত্র ও স্বাধীন দলিল। এখন আপনি বলেছেন কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক চার মযহাব তৈরি করা হয়নি। এজমা ও কিয়াস করে চার মযহাব তৈরি করা হয়েছে। তাই মাওলানা মতিউর রহমানকে আপনি বলেছেন ইজমা ও কিয়াসকে যখন মেনে নিলেন তখন চার মযহাবকে মেনে নিতে আপত্তি কেন?

শুনুন আইউব হোসেন সাহেব, ইজমা ও কিয়াস করে কোন দিন মুসলিম ইউনিটিকে ভেঙ্গে চার ভাগ করা হয়নি। প্রত্যেক দলের অন্ধভক্তি, গোঁড়ামি, জিদ ও হঠকারীতাই ছিল এর মূল কারণ। যদি বলেন না এজমা হয়েছিল। তাহলে কোন্ পার্লামেন্টে কে কে বসে মুসলিম ঐক্যকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়ে চারভাগে বিভক্ত করেছিলেন তাদের নামের তালিকা আপনাকে পেশ করতেই হবে। আর আল্লাহ্ যে বলছেন, আল্লাহ্র বিধানকে তোমরা একযোগে মজবুতভাবে ধরে থাকো, খবরদার একাধিক দলে বিভক্ত হয়ো না। আল্লাহ্র এই অর্ডিন্যান্সকে পদাঘাত করে একাধিক দল তৈরি করার অধিকার তাদের কে দিলো এ প্রমাণও আপনাকে দিতে হবে। আর তা না হলে আজ থেকে এসব ধোকাবাজি কথা আপনাকে ছাড়তে হবে।

আইউব হোসেন সাহেব আপনি আহলে হাদীসদেরকে 'বেদআতি ফেরকা' বলে গালি দিয়েছেন এটা আপনার মতো নিম মোল্লার মুখ থেকেই শুনলাম। আপনাকে ধন্যবাদ যে 'উল্টা চোর কতোয়ালকে ডাঁটে' প্রবাদ বাক্যটিকে আপনি আমল করে দেখিয়ে দিলেন। বলি যারা পরবর্তী যুগের নবাবিষ্কৃত দলে আছে তারা বেদআতি না সাহাবায়ে কেরামের সেই এক মযহাবকে যারা আঁকড়ে ধরে আছেন তারা বেদআতি? আমি আপনাকে অনুরোধ করছি আপনি এলেমের দিক দিয়ে একেবারে এতিম। আপনার দু'লাইন স্বদেশী আরবীতেই সেটা ধরা পড়েছে। আপনি কিছুদিন আহলে হাদীসের দ্বারা পরিচালিত কোন বড় মাদরাসায় পড়াশোনা করুন। দেখবেন ইনশাআল্লাহর আপনার গোলক ধাঁধা ছুটে যাবে– অন্ধত্ব ঘুচে যাবে।

http://islaminonesite.wordpress.com

আপনি হাঁস-মুরগির ডিমের দলিল খুঁজে পাননি? শুনুন মসজিদের একজন সাধারণ মুসল্লীকে জিজ্ঞেস করবেন তিনিই আপনাকে বলে দিবেন যে আল্লাহর নবী (দঃ) ডিমকে ভালবাসতেন। জুমার দিনে খুতবার আগে যারা প্রথমে যাবে তারা উট কুরবানীর সওয়াব পাবে, তারপর যারা যাবে তারা গরুর সওয়াব পাবে, তারপর যারা যাবে তারা দুম্বার সওয়াব পাবে, তারপর যারা যাবে তারা মুরগির সওয়াব পাবে এবং তারপর যারা যাবে তারা ডিমের সওয়াব পাবে। তাহলে উট, গরু, দুম্বা, মুরগি যদি হালাল হয় ডিমের বেলায় ব্যতিক্রম কেন? এক যাত্রায় পৃথক ফল ফলবে কেন?

আপনি লাইফ ইনসিওরেন্সের কথা বলেছেন। আপনাকে জিজ্ঞেস করি, আপনি কি কোন আহলে হাদীস আলেমকে ইন্স্যুরেন্স হালাল– এই ফতোয়া দিতে দেখেছেন। শুনুন, মদ হারাম কিন্তু তার নাম বদলিয়ে সঞ্জিবনী শূরা নাম রাখলেই সেটা হালাল হয়ে যাবে না। আমি আগেই বলেছি, পড়াশুনা করুন, পড়াশুনা করুন, অন্ধভক্তি ছাড়ুন। জেনে রাখুন, এজন্য তাদের দরজা চিরদিন খোলা থাকবে।

শুনুন আইউব হোসেন সাহেব, আপনারা কয়েকখানা বই প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বইগুলোর নাম রেখেছেন–

১. তরিকায়ে মোহাম্মদীর দন্তচুর্ণ জওয়াব

২. মোছাফাহা এক হাতে না দু'হাতে

৩. মযহাব বিরোধীগণ বেদআতি হইবার দলিল

৪. ঈদের বারো তকবিরের সমস্ত হাদীছ যয়ীফ

৫. আহলুল হাদীস কাহারা

৬. তারাবী আট নয় বিশ রাকাত

আমি কিন্তু আপনাদের এই সিদ্ধান্তে খুশি হলাম। তাড়াতাড়ি বাহির করুন। ইনশাআল্লাহ কুরআন-হাদীসের বলিষ্ঠ দলিল দ্বারা মস্তকচূর্ণ জওয়াব দেওয়ার জন্য আমি প্রস্তুত আছি। ইতি–

মোঃ আবু তাহের বর্দ্ধমানী
দিনাজপুর
১৫/২/১৯৮৮

http://islaminonesite.wordpress.com

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

হক মীমাংসা প্রসঙ্গে

শরীয়তের অনেক মাসলা-মাসায়েল নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে যুগ যুগ ধরে মতভেদ চলে আসছে। ইমামের পেছনে সূরা ফাতেহা পড়তে হবে কি না? নামাযের সময় বুকে হাত বাঁধতে হবে কিনা? শব্দটা 'ফদল' হবে না 'ফজল' হবে? কাদী সাহেব হবে না কাজী সাহেব হবে? ফদলুর রহমান হবে না ফজলুর রহমান? মুসাফা এক হাতে হবে না দু'হাতে কাঁচি মার্কা? তারাবীহ আট রাকাত না বিশ রাকাত, না আরও কিছু? রুকু করার সময় ও দাঁড়াবার সময় দু'হাত কান অথবা কাঁধ পর্যন্ত উঠাতে হবে কিনা? – এরূপ শত শত মসলা নিয়ে মুসলমানদের আপোষে মতবিরোধ চলে আসছে। আলেমদের নির্দেশক্রমে সাধারণ লোক যে যা আমল করেন নেক খেয়ালেই করেন। কিন্তু তুলনামূলকভাবে যে দলিল অধিকতর বলিষ্ঠ, আলেম সমাজের উচিত সেই দিলকে মজবুত করে ধরে থাকা এবং সাধারণ লোককে ভদ্রভাবে, শান্ত মেজাজে, সুন্দরভাবে বুঝিয়ে সুজিয়ে সেই আমলে উৎসাহিত করা। কিন্তু বলিষ্ঠ দলিলের দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে কিছুসংখ্যক লোকের কাছ থেকে শস্তা বাহবা নেওয়ার মানসে, নিজের পার্টির মতটাকে ঠিক রাখার উদ্দেশ্যে যদি কোন আলেম অপর পক্ষকে কুৎসিত ভাষায় কটাক্ষ করেন তাহলে তার ফল হয় খুবই মারাত্মক।

সম্প্রতি চার টাকা দামের চল্লিশ পৃষ্ঠার 'হক মীমাংসা' নামক একখানা বই আমাদের হস্তগত হয়েছে। বইখানা লিখেছেন রাজশাহী টাইটেল মাদ্রাসার জনৈক মুদার্রেস সাহেব। নাম তার মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন।

তারাবীহ নামাজের মীমাংসা করতে গিয়ে তিনি যে ভাষায় বাংলাদেশের কুরআন ও সুন্নাহপন্থী এক কোটি আহলে হাদীসের প্রতি কটাক্ষ করে অশ্রাব্য ভাষা প্রয়োগ করেছেন, তাতে কোন বিবেক সম্পন্ন ঈমানদার মুসলমানের বিবেক আহত না হয়ে পারে না। একজন আলেমের মুখ দিয়ে এভাবে 'পুরীষ' উদ্‌গীরণ সত্যিই দুঃখজনক।

http://islaminonesite.wordpress.com

তবে আমরা শুনেছি তিনি রংপুরের জুমারবাড়ি এলাকায় বিরাট এক বাহাসের মজলিসে বাহাস করতে গিয়ে লজ্জাকরভাবে পরাজিত হয়ে পালিয়ে আসেন। আমাদের মনে হয় পরাজয়ের সেই গ্লানি সহ্য করতে না পেরে তিনি এই পথ অবলম্বন করেছেন। অবশ্য যাদের এস্‌তেক্‌লালের অভাব তাদের পক্ষে এরূপ পরিস্থিতিতে বিকারগ্রস্থ রোগীর মতো আবোল-তাবোল বকা স্বাভাবিক। কিন্তু তার মতো একজন আলেমের পক্ষে এভাবে অস্থির হওয়া উচিত হয়নি।

জানি তিনি একজন ফেরকা-পোরস্ত লোক। চার ফেরকাকে তিনি মানেন আর বিশেষ করে হানাফী মতেই তিনি চলেন। অবশ্য তার বইয়ের এক জায়গায় তিনি নিজেকে আহলে হাদীস বলে দাবি করেছেন। বেশ ভাল কথা। কুরআন ও হাদীস যিনি মেনে চলবেন, তিনি বললেও আহলে হাদীস আর না বললেও আহলে হাদীস। আর যিনি রাসূলুল্লাহর (দঃ) হাদীসের উপর কোন ইমাম বা কোন দলের সিদ্ধান্তকে গুরুত্ব দিবেন, তিনি বললেও আহলে রায় আর না বললেও আহলে রায়। আমরা দোয়া করি আল্লাহ্ যেন তাকে আহলে হাদীসরূপে চলার তওফিক দান করেন।

আমরা তার রেসালাখানা পড়ে দেখলাম, কয়েক জায়গায় তিনি আহলে হাদীসদের প্রতি কটাক্ষের সুরে 'লামযহাবী' মযহাব বিদ্বেষী হাদীস অমান্যকারী প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করেছেন। আহলে হাদীস যে কারা? এবং এই কটাক্ষ কোথায় যেয়ে যে লাগবে এ আক্কেলটুকু তার থাকলে কখনই এই শব্দ তিনি ব্যবহার করতে পারতেন না।

আহলে হাদীসরা ইসলামে দলাদলি ও ভাগাভাগি পছন্দ করেন না বলে আলেম সাহেব যদি তাদেরকে 'লামযহাবী' মযহাব বিদ্বেষী বলে কটাক্ষ করেন তাহলে তারা নাচার। এখন যদি আলেম সাহেবকে কেউ জিজ্ঞেস করেন, আচ্ছা বলুন তোর চার ইমামের জন্মের আগে চার ফেরকা ছিল কোথায়? আর এই প্রশ্নের জওয়াব যদি তিনি মাথা ঠাণ্ডা করে দিতে যান, তাহলে মুসলমানদের মাঝে দলদলি আর ভাগাভাগি থাকবে কি?

একথা তো ঠিক যে, মহামতি ইমাম চতুষ্টয়ের কেউই রসূলুল্লাহর (দঃ) ২৩ বছরের নবী জীবনের সব হাদীস সংগ্রহ করতে পারেননি। কাজেই যিনি যত কম হাদীস সংগ্রহ করেছিলেন তাকে তত বেশি কিয়াসের আশ্রয়

http://islaminonesite.wordpress.com

নিতে হয়েছিল। অবশ্য প্রত্যেক ইমামই বলে গেছেন, আমার কথা আল্লাহর নবীর (দঃ) কথার সাথে মিলিয়ে দেখো, যদি মিলে যায় উত্তম। আর না মিললে আমার কথা ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর নবীর (দঃ) কথা মেনে নিও। কিন্তু পরবর্তী যুগে তা আর হলো না। ১৫০ হিজরীতে ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) ইন্তেকাল করলেন। তার ইন্তেকালের পর দেখা গেল তাঁর ছাত্ররা যেসব মাদ্রাসা তৈরি করলেন, সেইসব মাদ্রাসার সিলেবাসে ইমাম সাহেবের রায় ও সিদ্ধান্তগুলোকে ঢুকিয়ে দিয়ে হানাফী মাযহাব কায়েম করলেন এবং নিজেদেরকে হানাফী বলে পরিচয় দিতে লাগলেন।

১৭৯ হিজরীতে যখন ইমাম মালেক (রহঃ) ইন্তেকাল করলেন, তার ছাত্ররাও তাদের ইমাম মালেকের সিদ্ধান্তগুলোকে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসার পাঠ্য তালিকায় ঢুকিয়ে দিয়ে মালেকী মাযহাব কায়েম করলেন এবং নিজেদেরকে মালেকী বলে পরিচয় দিতে লাগলেন।

২০৪ হিজরীতে ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) যখন ইন্তেকাল করলেন তখনও দেখা গেল ইমাম শাফেয়ীর ছাত্ররা ইমাম সাহেবের সিদ্ধান্তগুলোকে নিজেদের মাদ্রাসায় পড়াতে শুরু করে দিলেন এবং শাফেয়ী মাযহাব কায়েম করে নিজেদেরকে শাফেয়ী বলে পরিচয় দিতে লাগলেন।

আর ২৪১ হিজরীতে যখন ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) ইন্তেকাল করলেন তখনও দেখা গেল অনুরূপভাবে ইমাম আহমদের ছাত্ররা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসায় ইমাম সাহেবের অভিমতগুলোকে ঢুকিয়ে দিয়ে হাম্বলী মাযহাব কায়েম করলেন এবং নিজেদেরকে হাম্বলী বলে পরিচয় দিতে লাগলেন।

তাহলে এখানে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, চার ইমামের জীবদ্দশাতেও কোন মুসলমান নিজেদেরকে হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী, হাম্বলী বলে পরিচয় দেননি। শাহ্ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দেস দেহ্লবী ও তাঁর 'ইযালাতুল খফা' গ্রন্থে লিখেছেন, বনু উমাইয়া শাসনের অবসানকাল অর্থাৎ কমপক্ষে ১৫০ হিজরী পর্যন্ত কোন মুসলমান নিজেকে হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী, হাম্বলী বলতেন না। এসব নামকরণ হলো ইমামদের পরে। তারপর এখতেলাফী বিষয় নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ করে চার ফেরকার লোকেরা কি অনর্থের সৃষ্টি করেছিল, বাগ্দাদের পতন কাহিনীর ইতিহাস যারা পড়েছেন তাদের

http://islaminonesite.wordpress.com

অজানা নেই। এত করেও চেতনা ফেরেনি। ৮০১ হিজরীতে ফারাহ বিন বারকুকের সময় কাবা ঘরের চারদিকে ফেরকাপোরস্তরা চার মুসাল্লা কায়েম করে তবে ছাড়লো। সাধক কবি রুমি বড় দুঃখের সাথে বলেছেন–

'দীনে হক রা চার মাযহাব সাখ্‌তান্দ
রখ্‌না দর দীনে নবী আন্‌দাখ তান্দ।'
অর্থ : সত্য দীনকে চার মাযহাবে বিভক্ত করলো।
নবীর দীনে বিপর্যয় ঘটিয়ে দিলো।

যা হোক, আল্লাহর অসীম অনুগ্রহে বাদশাহ ইব্‌নে সাউদ চার মুসাল্লা উঠিয়ে দিয়ে এক জামাত কায়েম করেছেন। এখন সেখানে শৃংখলার সাথে একই জামাতে নামায হয়ে থাকে।

বলাবাহুল্য, ফেরকা-পোরস্তরা কেবল আল্লাহর দীনকে চার মাযহাবে বিভক্ত করেই ক্ষান্ত হয়নি। পরবর্তীকালে ১৩০ ফরজ নাম দিয়ে যেসব লেখা বের করা হয়েছে তাতে চার মাযহাবকে চার ফরজ বলে প্রচার করা হয়েছে। হানাফী মাযহাবের একজন যোগ্য আলেম ও লেখক নোয়াখালি জেলার সাত্রাপাড়া নির্বাসী আলহাজ কাজী মওলানা মোঃ গোলাম রহমান সাহেবের লেখা 'মকছুদুল মোমেনীন' বা বেহেশতের কুঞ্জি বই খানার ১৪১ পৃষ্ঠায় দেখছি, লেখক ১৩০ ফরজ গণনা করতে গিয়ে লিখেছেন–

"৪ মাযহাব ৪ ফরজ। যথা– হানাফী, শাফেয়ী, হাম্বলী ও মালেকী।১

৪ কুরছী ৪ ফরজ। যথা– মোহাম্মদ (দঃ) আবদুল্লাহর পুত্র। আবদুল্লাহ আবদুল মুত্তালিবের পুত্র। আবদুল মুত্তালিব হাসেমের পুত্র। হাসেম মান্নাফের পুত্র।

এবার লেখক উক্ত পৃষ্ঠার টীকায় লিখেছেন– টীকা : ১. ও ২. উক্ত দুই দফার ৮ ফরজের ফরজিয়াতের কোন দলিল নেই। কেবল আম লোকের আকাঙ্খা পুরণার্থে এরূপ ১৩০ ফরজের শুমার করা গেল।

পাঠক! এখানে চিন্তা করুন, যে বিষয়ের কোন দলিল প্রমাণ নেই সেই দলিলবিহীন ভিত্তিহীন বিষয়কে যারা ফরজ বলে চালিয়ে দিতে পারে, তারা পারে না কি? তাদের দ্বারা অসম্ভব বলে আর থাকলো কি? একটা ভাতে টিপ দিলেই তো হাড়ির সব ভাতের অবস্থা জানা যায়। যাক, কথা বাড়িয়ে

http://islaminonesite.wordpress.com

আর কাজ নেই। আল্লাহ্ যদি তওফিক দেন আর প্রয়োজন যদি মনে করি তাহলে এ ব্যাপারে বিস্তারিতভাবে লেখার ইচ্ছা থাকলো।

আমরা বলতে চাই, যাদের আল্লাহ্ এক, নবী এক, কাবা এক, কুরআন এক– তাদেরকে একই হতে হবে। ইসলামকে নিয়ে ভাগ-বাটোয়ারা চলবে না। আল্লাহ্ বলেন, "ওয়াতাসেমু বিহাবলিল্লাহি জামিআও ওয়ালা তাফাররাকু।" তোমরা আল্লাহর বিধানকে মজবুত করে ধরে থাকো। খবরদার বিভিন্ন দলে ও বিভিন্ন মতে বিভক্ত হয়ো না।

আল্লাহর ফজলে ১৫০ হিজরী পর্যন্ত মুসলমানরা মাযহাবী ফেরকায় বিভক্ত হয়নি। পরবর্তী যুগে অখণ্ড মুসলিম জামাতের মাঝে ফাটল ধরানো হয়েছে। এই ফাটল ধরিয়ে দিয়ে কেউ যদি আহ্লাদে আটখানা হয়ে বলে, আমরা মস্ত বড় বাহাদুরি করেছি তাহলে তাদেরকে আর কি বলা যাবে?

আলেম সাহেব যদি মহামতি ইমামগণের দিকে লক্ষ্য করেন তাহলে পরিষ্কারভাবে দেখতে পাবেন তারা প্রত্যেকেই আহলে হাদীস ছিলেন। ইমাম আবু হানিফা (রহ) বলেছেন, "ইযা সাহ্হাল হাদীস ফাহুয়া মাযাহাবী"– যখন সহীহ হাদীস পাবে সেটাকে আমার মাযহাব বলে জানবে। (রদ্দুল মুহতার-১, পৃঃ ৪৬২)।

ইমাম সাহেব আরও বলেছেন, "ইযা রাআয়তুম কালামানা ইয়োখালেকু যাহেরাল কিতাবে ওয়াস্ সুন্নাতে, ফামালু বিল কিতাবে ওয়াস্ সুন্নাতে ওয়ায্রেবু বেকালামিনাল হায়েত"– তোমরা যদি আমার কোন কথা কুরআন ও সুন্নাতের বিপরীত দেখতে পাও তাহলে আমার কথাকে দেওয়ালের গায়ে পটকা মেরে ফেলে দিয়ে কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক আমল করবে। (মীযানে কুবরা-১, পৃঃ ৫৭)।

ইমামে আজম আরও বলেছেন, "উত্রুকু কাওলী বেখাবরে রাসূলিল্লাহে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম"– আল্লাহর রসূলের (দঃ) কথার মোকাবিলায় তোমরা আমার কথাকে ছেড়ে দিও।" (ইকদুলজীদ, পৃঃ ৫৪)।

অনুরূপভাবে ইমাম মালেক (রহঃ) এ কথাই বলেছেন, "ইন্নামা আনা বাশারুন, উসীবো ওয়া উখতি, ফা আরেযু কাওলি আ'লাল কিতাবে ওয়াস্ সুন্নাতে লা তোকাল্লেদূনী"– আমি একজন মানুষ মাত্র। কোন বিষয়ে আমার সিদ্ধান্ত ঠিকও হতে পারে আবার ভুলও হতে পারে। অতএব

http://islaminonesite.wordpress.com

তোমরা আমার কথা কুরআন ও সুন্নাহর দ্বারা যাচাই করে দেখবে। খবরদার তোমরা আমার অন্ধ অনুসরণ করো না। (ফতোয়া ইবনে তায়মিয়াহ-২, পৃঃ ৩৮৪)।

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) ঠিক অনুরূপ কথাই বলেছেন। তিনি বলেন, "লা হুজ্জাতা ফি কাওলে আহা'দিন দুনা রাসূলিল্লাহে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, লা-ফী কিয়াসিন ওলা ফী শায়ইন"– আল্লাহর রসূলের (দঃ) কথা ব্যতীত কাহারো কথাই দলিল নয়। কিয়াস হোক কিংবা অন্য কোন ব্যাপারে হোক। (হুজ্জাতুল লাহিল বালেগা, পৃঃ ১৩৬)।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) বলেছেন, "লা তুকাল্লিদুনী ফী কুল্লে মা আকুলো"– আমার প্রতিটি কথার তোমরা অন্ধ অনুসরণ করো না। (মীযান)

মহামতি ইমাম সাহেবগণ এ ধরনের বহু কথা বলে গেছেন। এখন যদি মুসলমানদের একটি দল ইমাম সাহেবদের আদেশকে শিরোধার্য করে কুরআন ও সুন্নাহকে প্রাধান্য দেন; আর আলেম সাহেব যদি তাদেরকে 'লা মাযহাবী' বলে বিদ্রূপ করেন তাহলে তার কথাকে কি কেউ সমর্থন দিবে? তিনি জেনে রাখুন, আহলে হাদীসরা মহামতি ইমামগণকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করেন। চার মাযহাবকে তারা কখনো ঘৃণা করেন না। তবে যে মাযহাবের যে যে দলির কুরআন ও সুন্নাহর সাথে অধিকতর সুসমঞ্জস্য সেই দলিলকেই তারা গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। হানাফী ফেকার কোন দলিলের চেয়ে শাফেয়ী মাযহাবের কোন দলির যদি কুরআন ও সুন্নাহর সাথে অধিকতর সুসমঞ্জস্য হয় তাহলে আহলে হাদীসরা সেই শাফেয়ী মাযহাবের দলিলকেই মেনে চলেন। আবার শাফেয়ী মাযহাবের কোন দলিলের চেয়ে হানাফী মাযহাবের কোন দলিলর যদি কুরআন-সুন্নাহর সাথে অধিকতর সুসমঞ্জস হয়। তাহলে আহলে হাদীসরা হানাফী মাযহাবের সেই দলিল মেনে চলেন। এভাবে চার মাযহাব সম্পর্কেই তারা এই নীতি অবলম্বন করে চলেন। বলতে গেলে আহলে হাদীসরা চার মাযহাবেই আছেন। আহলে হাদীসরা কুরআন ও সুন্নাহর উপরই আছেন। আল্লাহর ফজলে আহলে হাদীসরা সঠিক পথেই আছেন।

এবার আলেম সাহেবকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করেন, আচ্ছা বলুনতো, চার ইমামের আগে যেসব মুসলমান ছিলেন, তারা কোন্ মাযহাবে ছিলেন?

http://islaminonesite.wordpress.com

হযরত আবুবকরের (রাঃ) মাযহাব কি ছিল? হযরত ওমরের রাঃ) মাযহাব কি ছিল? সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণের মাযহাব কি ছিল? সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণের মাযহাব কি ছিল? তখন তো চার ইমামের জন্ম হয়নি আর চার মাযহাবও কায়েম হয়নি। তাহলে আলেম সাহেবের কথা মত তাঁরা কি 'লা মাযহাবী' ছিলেন? তাই বলছিলাম, আলেম সাহেব আহলে হাদীসদেরকে যে 'লা মাযহাবী' বলে কটাক্ষ করেছেন সে কটাক্ষ কোথায় গিয়ে লাগছে একথা কি জনাবের মগজে ঢুকবে? তিনি যেন সব সময় সৈয়দ মহিউদ্দীন আবদুল কাদের জিলানীর (রহঃ) একটা কথা স্মরণ রাখেন। তিনি বলেছেন, বেদআতী লোকের আলামত হচ্ছে আহলে হাদীসগণকে মন্দ বলা। তিনি আরও বলেছেন, এই হক জামাতের একটি মাত্র নাম আছে। তাছাড়া অন্য কোন নাম নেই এবং তা হচ্ছে 'আহলে হাদীস'। (গুনিয়াতুত তালেবীন, ১ম খণ্ড পৃঃ ৯০, মিসরী ছাপা)।

সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণ যে আহলে হাদীস ছিলেন এ কথা যদি তিনি জানতে চান তাহলে তায্‌কিরাতুল হুফ্‌ফাযের ১ম খণ্ড ২৯ পৃষ্ঠা খুলে দেখবেন হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) নিজকে আহলে হাদীস বলতেন।

তারিখে বাগদাদের ৫ম খণ্ড ২২৭ পষ্ঠা খুলে দেখুন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে (রাঃ) আহলে হাদীস বলা হতো।

খতিব, বাগ্‌দাদীর কিতাবুশ শরফের ২১ পৃষ্ঠা খুলে দেখুন, হযরত আবু সাঈদ খুদরী তাবেয়ীগণকে লক্ষ্য করে বলতেন, তোমরাই আমাদের স্থলাভিষিক্ত এবং আমাদের পর তোমরাই আহলে হাদীস।

তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাযের (১৪) ৭২ পৃষ্ঠায় দেখবেন, ইমাম শাবী পাঁচশ সাহাবার সাক্ষাত লাভ করেছিলেন। এবং আটচল্লিশ জন সাহাবার নিকট হাদীস পড়েছিলেন। তিনি সাহাবাদের সকলকেই আহলে হাদীস বলেছেন।

আবদুল কাহের বাগ্‌দাদীর উসুলুদদীনের ১ম খণ্ডের ৩১৭ পৃষ্ঠা খুলে দেখুন লেখা আছে, "সগুরুর রুমে ওয়াল জাযিরাতে ওয়াশ শামে ওয়া আজার বায়জান, ওয়া বাবুল আব্‌ওয়াবে কুল্লো আহ্‌লেহা কানু আলা মাযহাবে আহলিল হাদীস। ওয়া কাযালিকা সগুরুল আফ্‌রিকিয়াতে ওয়া ইনুদুলুস ওয়া কুল্লো সগুরে ওয়ারায়ে বাহ্‌রিল মাগরিবে কানু আলা মাযহাবে আহ্‌লিলহাদীস। ওয়া কাযালিকা সগুরুল ঈমানি আলা সাহেলিয্‌যান্‌জে কানু আলা মাযহাবে আহলিল হাদীস।"

http://islaminonesite.wordpress.com

রূম সীমান্ত আলজিরিয়া, সিরিয়া, আজারবাইজান, বাবুল আবওয়াব প্রভৃতি স্থানের সকল মুসলমান অধিবাসী 'আহলে হাদীস' ছিলেন। অনুরূপভাবে আফ্রিকার সীমান্ত, স্পেন এবং পশ্চিম সাগরের পশ্চাৎবর্ত্তী সকল সীমান্তের মুসলমানরা আহলে হাদীস ছিলেন। ঐরূপ আবিসিনিয়ার উপকূলবর্তী ওমানের সমুদয় সীমান্তবাসী আহলে হাদীস ছিলেন।

বলা বাহুল্য, ঐ সকল স্থান যাদের দ্বারা বিজিত হয়েছিল তারা সকলেই সাহাবা ও তাবেয়ী ছিলেন। আর সাহাবা ও তাবেয়ীগণ আহলে হাদীস ছিলেন বলেই যে ঐ সকল বিজিত স্থানের মুসলমানরা আহলে হাদীসরূপে কীর্তি হতে পেরেছিলেন, তা দিবালোকের মতোই সত্য।

এ পর্যন্ত যা আলোচনা করা হলো তাতে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীনে ইযাম আহলে হাদীস ছিলেন। তাদের মাযহাব একই মাযহাব ছিল। আর যে কোন দেশে এবং যে কোন যুগে তাদেরকে যারা অনুসরণ করবেন, তারাই আহলে হাদীসরূপে কীর্তি হবেন। এই আহলে হাদীসদের সম্পর্কেই একটি হাদীস সাখাবীর আল কওলুলবাদীর ১৮৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে– হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রাসূল (দঃ) বলেছেন, যখন কিয়ামতের দিন আহলে হাদীসগণ কালির দোয়াতসমূহ সহ আসবেন তখন আল্লাহ্ বলবেন, তোমরা আহলে হাদীস জান্নাতে প্রবেশ করো।

এখন কথা হচ্ছে এই যে, যারা মহামতি ইমামগণের আদেশ শিরোধার্য করে সাহাবায়ে কেরামের পথে, তাবেয়ীনে ইমামের পথে, কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক চলার চেষ্টা করে আহলে হাদীসরূপে পরিচয় দেন, আর অখণ্ড মুসলিম জামাতকে খণ্ড খণ্ড কর একটা খণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে কেউ যদি তাদেরকে 'লা মাযহাবী' বলে উপহাস করে তাহলে তার চেয়ে আর চরম বেআদবী কি হতে পারে?

আমরা এ ব্যাপারে আহলে হাদীস ভাই-ভগ্নিদের বলবো, আপনারা প্রত্যেক ইমাম, খতিব, আলেম, ফকিহ, মুহাদ্দেস মুফতীকে সম্মান দিয়ে থাকেন। আপনাদের মধ্যে সংকীর্ণতা নেই। কাহারো প্রতি কোন কটাক্ষ নেই, কটুক্তি নেই। তবে দোষের মধ্যে একটি দোষ আপনাদের আছে। সেটি হলো কারো ব্যক্তিগত রায় বা কিয়াসকে আপনারা আল্লাহ্ ও

http://islaminonesite.wordpress.com

আল্লাহর নবীর হাদীসের উপর স্থান দেবেন না। এতে যদি আপনাদেরকে কেউ 'লা মাযহাবী' বলে বলুন, তাতে কিছুই যায় আসে না। জেনে রাখবেন, যার থুথু তার গায়েই ঘুরে গিয়ে লাগবে।

আলেম সাহেব তাঁর রেসালার ২৭ পৃষ্ঠায় রংপুরের মাওলানা আবু সায়েক আবদুর রহমান সাহেবকে 'কচ্ছপখোরী' বলে ব্যঙ্গ করেছেন। এ ব্যাপারে আমরা জনাবকে বলবো, কচ্ছপ আমরা খাই না, আপনিও খান না। লাখ লাখ কোটি কোটি মুসলমান খায় না। কিন্তু চার ইমামের মধ্যে কোন ইমাম যদি কচ্ছপ হালাল হওয়ার সমর্থনে রায় পেশ করে থাকেন, আর কোন আলেম যদি সেই রায়কে সমর্থন করেন, তাহলে তাঁকে বিরূপ করার কি আছে? তাকে বিদ্রূপ করা মানে যে সেই মহামতি ইমামকে বিদ্রূপ করা আর সেই মাযহাব পন্থীদেরকে বিদ্রূপ করা– এ জ্ঞানটুকু কি আপনার একেবারে হারিয়ে গেছে? আপনি যখন চার মাযহাবে বিশ্বাস তখন চার মাযহাবের মধ্যে যে কোন মাযহাবের যে কোন দলিলকে আপনি মানুন আর না মানুন, উপহাস করতে পারেন না। উপহাসই যদি করলেন তাহলে চার মাযহাবকে আর মানা হলো কই? আপনার অতি প্রিয় চার ফের্কার ফের্কা শাস্ত্রগুলো ঘেটেখুটে দেখবেন, নিশ্চয়ই কচ্ছপ হালালের সমর্থনে রায় পাবেন।

আচ্ছা শুনুন, হানাফী মাযহাবের দলিলে তো আছে, অযু করার পর সরাসরি লজ্জাস্থানে হাত লাগলে অজু টুটে না। এখন যদি রংপুরি সাহেব আপনাকে 'অযু করে ঐ জায়গায় হাত লাগিয়ে নামায পড়ানেওয়ালা' বলে বিদ্রূপ করেন, তাহলে কুৎসিত ভাষা প্রয়োগ করা ছাড়া আপনার কোন সদুত্তর আছে কি? তাই বলছিলাম, বেশি চুলকাবেন না ঘা হয়ে যাবে।

আলেম সাহেব রমযানের রাত্রিতে ২০ রাকাত তারাবীর সমর্থনে কয়েকটি দলিল ও যুক্তি খুব জোরে শোরে ফলাও করে পেশ করেছেন। আর ৮ রাকাত তারাবীর দলিলগুলোকে খুব লঘু ও হাল্কাভাবে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। শুধু তাই নয়, ২০ রাকাত তারাবীর বিপক্ষে ও ৮ রাকাত তারাবীর সপক্ষে হাদীস তত্ত্ব বিশারদগণের যেসব মন্তব্য রয়েছে সেগুলোকে তিনি বেমালুম হজম করে ফেলেছেন।

http://islaminonesite.wordpress.com

তারপর আহলে হাদীসরা হাদীস মানে না বলে খুব হাম্বিতাম্বি করেছেন। তাই আমরা মুসলমানদের মধ্যে তারাবীহ সম্পর্কে কয় প্রকারের অভিমত চালু আছে উল্লেখ করবো। এবং নিজের তরফ থেকে কোন কথা না বলে ৮ ও ২০ রাকাতের দলিল সম্পর্কে বিদ্বানগণের কার কি মন্তব্য তাই ব্যক্ত করবো মাত্র। তাতে আলেম সাহেবের হাম্বিতাম্বি টিকছে কিনা পাঠক-পাঠিকাগণ তার বিচার করবেন।

তারাবীহ সম্পর্কে আলোচনা

আমরা দেখতে পাই, তারাবীর রাকাত সংখ্যা সম্পর্কে মুসলমানদের মাঝে দশ প্রকারের অভিমত চালু আছে।

প্রথম অভিমত হচ্ছে, হানাফী মাযহাবের বিখ্যাত আলেম আল্লামা আয়েনী বলেছেন, বিদ্বানগণের একটি দল বেতেরসহ ৪১ রাকাত তারাবীহ পড়াকে মুস্তাহাব মনে করেন। (উমদাতুলকারী-৫, পৃঃ ৩৫৫)।

ইমাম তিরমিযী বলেছেন, কোন কোন বিদ্বান বেতেরসহ ৪১ রাকাত তারাবীহ পড়ার কথা ব্যক্ত করেছেন। আর ইহাই মদিনার বিদ্বানগণের সিদ্ধান্ত এবং তারা এই অনুসরণ করতেন। (তিরমিযী-২, পৃঃ ৭৩)।

আস্ওয়াদ বিনে ইয়াযিদ সম্পর্কে জানা যায়, তিনি ৪০ রাকাত তারাবীর পর ৭ রাকাত বেতের পড়তেন। (উমদাতুল কারী-৫, পৃঃ ৩৬৫)।

দ্বিতীয় অভিমত হচ্ছে, ইমাম মোহাম্মদ বিন নসর মরওয়াযী ইবনে আয়মন থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম মালেক বলেছেন রমযান মাসে ৩৮ রাকাত তারাবীহ পড়াই ভাল। তারপর ইমাম ও মুকতাদী সালাম ফিরে এক রাকাত বেতের পড়বে। হাব্রার দুর্ঘটনার কয়েক বছর আগে থেকে আজ পর্যন্ত শতাধিক বছর ধরে মদীনাবাসীগণ এভাবেই নামায পড়ে আসছেন। (কিয়ামুল লায়েল, পৃঃ ৯২)।

তৃতীয় অভিমত হচ্ছে, মোহাম্মদ বিন নসর সনদ ব্যতিরেকে বর্ণনা করেছেন আর আল্লামা আয়েনী ইবনে ওহাবের সনদের বর্ণনা করেছেন যে, আমি দেখলাম, জনগণ ৩৯ রাকাত তারাবীহ পড়ছেন, তন্মধ্যে বেতের

http://islaminonesite.wordpress.com

পড়লো তিন রাকাত। হাফেজ ইবনে হজর বলেছেন, ইমাম মালেকের উক্তি হলো তারাবীহ ৩৬ রাকাত পড়তে হবে। (উমদা ও কিয়াম, পৃঃ ৯২)।

চতুর্থ অভিমত হচ্ছে, আল্লামা আয়েনী জুরারা বিনে আওফা সম্পর্কে লিখেছেন, তিনি রমযানের শেষ দশকে ৩৪ রাকাত তারাবীহ পড়তেন। (উমদাতুল কারী)।

পঞ্চম অভিমত হচ্ছে, আল্লামা আয়েনী জুরারা বিনে আওফা সম্পর্কে লিখেছেন, তিনি রমযানের প্রথম দুই দশকে ২৮ রাকাত তারাবীহ পড়তেন আর সাঈদ বিনে যোবায়ের রমযানের শেষ দশকে ২৮ রাকাতা তারাবীহ পড়তেন। (উমদা)।

ষষ্ঠ অভিমত হচ্ছে, উরকা বিনে আয়াশ ইমাম মরওয়াযীর কাছে বর্ণনা করেছেন যে, সাইদ বিনে যোবায়ের রমযানের প্রথম হতে বিশ রাত পর্যন্ত প্রত্যহ ২৭ রাকাত তারাবীহ পড়তেন। কিন্তু শেষ দশক শুরু হলে তারাবীহ বেশি করে পড়তেন। (কিয়ামুল লায়েল, পৃঃ ৯২)।

সপ্তম অভিমত হচ্ছে, ইমরান বিনে হুদায়েব ইমাম মরওয়াযীর নিকট বর্ণনা করেছেন যে, আবু মিজলম তাদেরকে ১৬ রাকাত তারাবীহ পড়াতেন আর প্রত্যেক নামাযে এক মনজিল করে কুরআন খতম করতেন।

(কিয়ামুল লায়েল, পৃঃ ৯২)।

এ পর্যন্ত সাত প্রকারের অভিমতের কথা উল্লেখ করা হলো। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, উক্ত সাত প্রকারের অভিমত আল্লাহর রসূল (দঃ) থেকে প্রমাণিত নয়। অতএব উক্ত অভিমতগুলো নির্ভরযোগ্য নয়। এখন বাকি থাকছে আর তিনটি।

অষ্টম অভিমত হচ্ছে, আরাজের মুখ থেকে শুনে দাউদ বিন হাসিন বলেছেন, হযরত উমরের সময় রমযান মাসে লোকেরা কাফেরদের উপর লা'নত করতো এবং কারী আট রাকাত তারাবীহ পড়াতেন এবং তাতে সূরা বাকারাহ পাঠ করতেন। কিন্তু যেদিন ১২ রাকাত পড়াতেন এবং উক্ত ১২ রাকাতে সূরা বারাকাহ খতম করতেন সেদিন লোক বুঝতো যে আজ নামায হালকা হলো। (মুআত্তা)।

http://islaminonesite.wordpress.com

এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে এই যে, কারী সাহেবকে ১২ রাকাত তারাবীহ কে পড়াতে বলেছিলেন তার কোন উল্লেখ নেই। হতে পারে হযরত উমরের বিনা হুকুমেই তারা ১২ রাকাত পড়েছিলেন।

নবম অভিমত হচ্ছে, ২০ রাকাত সম্পর্কে। এই ২০ রাকাত তারাবীহ সম্পর্কে যতগুলো দলিল আছে আমি একের পর এক উল্লেখ করে যাবো এবং আমি নিজের তরফ হতে কোন কথা না বলে উক্ত দলিলগুলো সম্পর্কে বিদ্বানগণ কে কি মন্তব্য করেছেন তাই উল্লেখ করে যাবো মাত্র।

ইবনে আবি শায়বা থেকে তাবারানী, বায়হাকী, ইবনে আদি ও বাগাবী, আবু শায়বা থেকে হযরত ইবনে আব্বাসের প্রমুখ বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর নবী (দঃ) রমযান মাসে ২০ রাকাত তারাবীহ এবং বেতের পড়তেন। এই হাদীস সম্পর্কে ইমাম বায়হাকী বলেছেন, এই হাদীসটি কেবলমাত্র আবু শায়বা রেওয়ায়েত করেছেন এবং তিনি হচ্ছেন দুর্বল।

(তলখিসুল হবীব, পৃঃ ১১৯)।

হাফেজ ইবনে হজর বলেন, উক্ত হাদীসের সনদ অত্যধিক দুর্বল।

(ফতহুল বারী-৩, পৃঃ ১৮১)।

হানাফী মাযহাবের বিখ্যাত আলেম আল্লামা ইবনুল হুমাম হেদায়ার টীকায় বলেছেন, হাদীসটি আবু শায়বার জন্য নির্ভরযোগ্য নয়। ইনি ইমাম আবু বকর বিন আবি শায়বার পিতামহ এবং সমুদয় হাদীসতত্ত্ব বিশারদ তার দুর্বল হওয়া সম্পর্কে একমত হয়েছেন।

(ফতহুল কাদীর-১, পৃঃ ২০৫)।

হানাফী মাযহাবের প্রখ্যাত আলেম আল্লামা জয়লয়ী বলেন, হাদীসটি আবু শায়বার জন্য দূষিত হয়েছে। কারণ তার জঈফ হওয়া সম্পর্কে বিদ্বানগণের মধ্যে মতভেদ নেই। ইবনে আদী নিজের কামেল গ্রন্থে আবু শায়বাকে হাল্কা বলেছেন। (নসবুর রায়া-১, পৃঃ ২৯৩)।

হানাফী মাযহাবের প্রথিতযশা আলেম আল্লামা আয়েনী বুখারীর ভাষ্য গ্রন্থে বলেছেন, আবু শায়বা ওয়াসেত শহরের কাজী ছিলেন। ইনাকে শোবা মিথ্যুক বলেছেন। ইমাম আহমদ, ইবনে মঈন, ইমাম বুখারী ও ইমাম নাসাঈ প্রভৃতি ইনাকে জঈফ বলেছেন। ইবনে আদী এই হাদীসটিকে প্রত্যাখ্যাত হাদীসসমূহের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। (উমদাতুল কারী-২, পৃঃ ৩৫৯)।

http://islaminonesite.wordpress.com

হাফেজ ইবনে হাজর বলেছেন, আবু শায়বার হাদীস পরিত্যাজ্য। তিনি সপ্তম স্তরের বিদ্যান, ১৬৯ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। (তকরিবুত তাহ্‌যীব) ইবনে মঈন ও আবু দাউদ তাকে জঈফ বলেছেন। ইমাম নাসায়ী তার হাদীস বর্জনীয় বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। (খুলাসা, পৃঃ ২০)।

ইমাম আহমদ, ইমাম আবু দাউদ ও ইয়াহ্‌ইয়া আবু শায়বাকে জঈফ বলেছেন। ইয়াহ্‌ইয়া বিন মুঈন বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। ইমাম বুখারী বলেন, তার হাদীস পরিত্যাজ্য। ইমাম তিরমিযী বলেন, তার হাদীস দোষণীয়। ইমাম নাসাঈ ও দায়লামী বলেন, তার হাদীস বর্জনীয়। আবু হাতিম বলেন, তিনি হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল, বিদ্বানগণ তার হাদীস বর্জন করেছেন। জওযানী বলেন, তিনি বর্জনীয়। সালেহ বলেন, তার হাদীস লেখা হবে না, তিনি হাকামের প্রমুখাৎ কতকগুলো দূষিত হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবু আলী নিশাপুরী বলেন, আবু শায়বা বলিষ্ঠ নহেন। আহ্‌ওয়াস বলেন, যে সকল দুর্বলের নিকট হতে আবু শায়বা রেওয়ায়েত করেছেন আবু শায়বা তাদের মধ্যে অন্যতম। মুআয্ ইবনে মুআয্ বলেন, আমি বাগদাদে শোবার নিকট আবু শায়বার হাদীসগুলো চেয়ে পাঠালে তিনি আমাকে লিখে জানান যে, আমি তার হাদীস রেওয়ায়েত করি না, কারণ তিনি ভাল লোক নন। দারকুতনা বলেন, আবু শায়বা দুর্বল। ইমাম আহমদ তাকে হাদীস শাস্ত্রে অগ্রাহ্য বলেছেন। (তাহ্‌যিবুয্ তাহযিব-১, পৃঃ ১৪৪)।

ইমাম বুখারী বলেন, আবু শায়বাকে বিদ্বানগণ গ্রহণ করেননি।

(কিতাবুয্ যুআফা, পৃঃ ২)।

আল্লামা আবদুল হাই লাখনোভী বলেন, ইরাকী স্বীয় আলফিয়ার টীকায় লিখেছেন, যার সম্বন্ধে ইমাম বুখারী খারাপ মন্তব্য করেছেন, তার হাদীস বর্জনীয় বুঝতে হবে। (আররাফউ ওয়াত তকমিল, পৃঃ ২০)।

মোট কথা, ২০ রাকাত তারাবীহ পড়া আল্লাহর রসূল (সঃ) কর্তৃক প্রমাণিত হয় এ সম্পর্কে যেসব হাদীস রয়েছে তা নির্ভরযোগ্য নয়। এহেন একটি দুর্বল, জঈফ, প্রত্যাখ্যাত, বর্জনীয় ও দোষণীয় হাদীস নিয়ে লম্ফঝম্ফ, তর্জন-গর্জন ও বাগাড়ম্বর করা কোন আলেমের পক্ষে উচিত নয়। ২০ রাকাত তারাবীহ সম্পর্কে আরও যেসব দলিল আছে সেগুলোও পরীক্ষা করে দেখা যাক। এজিদ ইবনে রুমান নামক এক ভদ্রলোকে ইমাম

http://islaminonesite.wordpress.com

মালেকের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত উমরের যুগে লোকেরা রমযান মাসে ২৩ রাকাত নামায পড়তেন। (মুআত্তা)।

কিন্তু তদন্ত করে দেখা গেছে, এই হাদীসটির সনদ বিচ্ছিন্ন। কারণ, এজিদ ইবনে রুমান হযরত উমরের ইন্তিকালের পর জন্মগ্রহণ করেছিলেন। হানাফী মাযহাবের বিখ্যাত আলেম আল্লামা জয়লয়ী লিখেছেন, এজিদ ইবনে রুমান উমরের সাক্ষাৎ লাভ করেননি। (নসবুর রায়া-১, পৃঃ ২৯৪)।

সুবিখ্যাত আল্লামা আয়েনী বুখারীর ভাষ্যগ্রন্থে অনুরূপ মন্তব্য করেছেন এবং লিখেছেন যে, এই হাদীসটির সনদে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে।

(উমাদতুল কারী-২, পৃঃ ৮০৪)।

২০ রাকাত সম্পর্কে হযরত উমর (রাঃ) থেকে আর একটি দলিল পাওয়া যাচ্ছে। ইয়াহ্ইয়া বিনে সাঈদ, ইবনে আবি শায়বার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত উমর জনৈক ব্যক্তিকে ২০ রাকাত পড়াবার আদেশ দিয়েছিলেন।

এখানেও তদন্ত করে দেখা গেছে, ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ হযরত উমরের সাক্ষাত লাভ করেননি। কেননা হযরত উমর (রাঃ) ইন্তিকাল করেছেন ২৩ হিজরীতে আর ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ ইন্তিকাল করেছেন ১৪৪ হিজরীতে।

হযরত উমরের নামে আর একটি দলিল পাওয়া যায়। সেটি হলো, সায়েব ইবনে এজিদ ইমাম বায়হাকীর কাছে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত উমরের যুগে লোকেরা রমযান মাসে ২০ রাকাত তারাবীহ পড়তেন।

এখানেও দেখা যাচ্ছে, যারা ১০ রাকাত তারাবীহ পড়তেন তারা যে হযরত উমরের নির্দেশক্রমেই পড়তেন, বায়হাকীর রেওয়ায়েত তার কোন উল্লেখ নেই।

মোট কথা, বিশ রাকাত তারাবীহ হযরত উমর (রাঃ) থেকে প্রমাণিত নয়। তিনি কাউকেও ২০ রাকাত তারাবীহ পড়ার আদেশ দেননি এবং নিজেও পড়েননি।

২০ রাকাত তারাবীহ সম্পর্কে আরও তিনটি দলিলের সন্ধান পাওয়া যায়। সেগুলোও পরীক্ষা করে বিদ্বানগণ কে কি বলেছেন দেখা যাক।

http://islaminonesite.wordpress.com

২০ রাকাত তারাবীহ সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী হযরত আলীর যে উক্তির ইঙ্গিত করেছেন উহা বায়হাকী স্বীয় সুনানে আর ইবনে আবি শায়বা তার মুসন্নফে আবুল হাসানার প্রমুখাৎ রেওয়ায়েত করেছেন। তিনি বলেন, হযরত আলী জনৈক ব্যক্তিকে পাঁচ বৈঠকে ২০ রাকাত তারাবীহ পড়ার আদেশ দিয়েছিলেন। (সুনানে কুবরা-২, পৃঃ ৪৯৭)।

হযরত আলী ২০ রাকাত তারাবীহ পড়ার আদেশ দিয়েছিলেন কিনা, তার সত্যাসত্য নির্ভর করছে বর্ণনাকারী আবুল হাসানার উপর। এই আবুল হাসানা সম্পর্কে বিদ্বানরা কে কি বলেছেন দেখা যাক। হাফেজ ইবনে হাজর বলেন, আবুল হাসানা মজহুল বা অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি। হাফেজ জহবী তাকে অপরিচিত বলেছেন। ইমাম বায়হাকীও এই হাদীসের সনদকে দুর্বল বলেছেন। (সুনান-২, পৃঃ ৪৯৭)।

ইমাম হয়হকী স্বীয় সুনানে হাম্মাদ বিনে শুয়াইবের মাধ্যমে হযরত আলীর প্রমুখাৎ ২০ রাকাত তারাবীর কথা উল্লেখ করেছেন।

এই দলিলটিরও সত্যাসত্য নির্ভর করছে হাম্মাদের বিশ্বস্ততার উপর। এই হাম্মাদ সম্পর্কে বিদ্বানরা কে কি বলেছেন দেখা যাক। এই হাম্মাদকে হাফেজ জহবী জঈফ বলেছেন। ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন মঈন বলেন, হাম্মাদের বর্ণিত হাদীস লেখা হবে না। ইমাম বুখারী বলেন, হাম্মাদ সম্বন্ধে আপত্তি আছে। ইমাম নাসায়ী বলেন, হাম্মাদ দুর্বল। আল্লামা ইবনুল হুমাম হানাফী মাযহাবের সুবিখ্যাত একজন আলেম। তিনি তাহ্রারুল উসুল কিতাবে লিখেছেন, ইমাম বুখারী যখন বলেছেন হাম্মাদ সম্বন্ধে আপত্তি আছে, তখন হাম্মাদকে গ্রাহ্য করা, তাকে বিশ্বস্ত মনে করা এবং তার হাদীস গ্রহণ করা চলবে না। অতএব হাম্মাদ হযরত আলী থকে ২০ রাকাত তারাবীর কথা যে রেওয়ায়েত করেছেন তা অগ্রাহ্য।

(তুহ্ফা-২, পৃঃ ৭৪-৭৫)।

ইমাম মরওয়াযী সুলায়মান আল আমাশ থেকে উল্লেখ করেছেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ কুড়ি রাকাত তারাবীহ ও তিন রাকাত বেতের পড়তেন। (কিয়ামুল লায়েল, পৃঃ ৯)।

এই রেওয়ায়তটিও অগ্রাহ্য। কেননা সুলায়মান আল আমাশের সাথে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের সাক্ষাতই হয়নি। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ

http://islaminonesite.wordpress.com

মদীনায় ইন্তিকাল করেছেন ৩২ অথবা ৩৩ হিজরীতে আর সুলায়মান আল আমাশ জন্মগ্রহণ করেছেন ৬১ হিজরীতে আর ইন্তিকাল করেছেন ১৪৮ হিজরীতে। (তকরীব ১০২, পৃঃ ১০৩)।

এ পর্যন্ত ২০ রাকাত তারাবীহ সম্পর্কে বিদ্বানগণের যে অভিমত পেশ করলাম, তাতে ২০ রাকাত তারাবীর দলির কতদূর নির্ভরযোগ্য পাঠকগণ তার বিচার করবেন। কিন্তু আলেম সাহেব বিদ্বানদের এসব অভিমতকে বিলকুল হজম করে ফেলে ২০ রাকাতে 'এজমা' হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। আমরা বলতে চাই, ইমাম বুখারী, ইমাম তিরমিযী, ইমাম আবু দাউদ, ইমাম নাসায়ী, ইমাম আহমদ, ইমাম বায়হাকী, হাফেজ ইবনে হজর, হাফেজ জহবী, আল্লামা ইবনুল হুমাম, আল্লামা জয়লয়ী, শোবা, ইবনে আদী, আল্লামা আয়েনী, ইবনে মঈন, আবু হাতেম, ইয়াহ্ইয়া, দয়লামী, জওযানী, সালেহ, আবু আলী নিশাপুরী, আহ্ওয়াস, দারকুতনী প্রভৃতি মহামতি ইমাম ও বিদ্বানগণ যেখানে ২০ রাকাতের দলিলগুলোকে দুর্বল, জঈফ, প্রত্যাখ্যাত, বর্জনীয় ও দূষিত বলে মন্তব্য করেছেন, সেখানে 'এজমা' হলো কাকে নিয়ে বুঝলাম না। ঘরে ঘরেই আপনারা সব 'এজমা' করে ফেললেন। বাহ্ কি চমৎকার কৃতিত্ব আপনাদের! আপনাদের এই মৌখিক ও ভিত্তিহীন দাবি হাস্যাস্পদ ছাড়া আর কি হতে পারে?

তবে হ্যাঁ, কয়েকটি দুর্বল হাদীস একত্রিত হলে সবলের দরজায় পৌঁছে যায় এ কথা মানি। কিন্তু কখন? যখন তার মোকাবিলায় কোন বিশুদ্ধ হাদীস থাকবে না তখন। যদি বিশুদ্ধ হাদীস পাওয়া যায় তখন দুর্বলকে ছাড়তেই হবে। ২০ রাকাতের মোকাবিলায় বিশুদ্ধ দলিল আছে কিনা দশম অভিমতে ইনশাআল্লাহ তা বুঝা যাবে।

দশম অভিমত হচ্ছে, বুখারী ও মুসলিম আবু সালাম ইবনে আবদুর রহমানের প্রমুখাৎ বর্ণনা করেছেন যে, তিনি মা আয়েশাকে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহর রসূল রমযানে কিরূপ নামাজ পড়তেন? মা আয়েশা বললেন, রমযান অথবা অন্য কোন মাসে রাসূলুল্লাহ (দঃ) এগারো রাকাতের বেশি নামায পড়তেন না। (বুখারী-৩ পৃঃ ৫৫, মুসলিম-১ পৃঃ ২৫৪)।

এই হাদীস থেকে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে, অন্য মাসের তাহাজ্জুদ ও রমযানের তারাবীহ, একই অনুষ্ঠানের পৃথক পৃথক নাম মাত্র। অন্য মাসে

http://islaminonesite.wordpress.com

আল্লাহর রসূল যেরূপ নৈশ নামায এগার রাকাত পড়তেন, রমযানেও তিনি সেইরূপ এগার রাকাতই তারাবীহ পড়তেন। তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ পৃথক পৃথকভাবে পড়তেন একথা ঠিক না। আমাদের কথা নয়, উপরোক্ত হাদীস প্রসঙ্গে হানাফী মাযহাবের সুপ্রসিদ্ধ আলেম আল্লামা বদরুদ্দীন আয়েনী বুখারীর ভাষ্য উমদাতুলকারী গ্রন্থে লিখেছেন, এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর রাসূল (দঃ) নিশিথে এগার রাকাতের অতিরিক্ত নামায পড়তেন না। রমযানেও না, অন্য সময়েও না। তিনি আরও বলেছেন, আল্লাহর রাসূর (দঃ) রমযানের শেষ দশকের রাত্রিগুলোতে যখন এবাদত বেশি করতেন তখন রাকাতগুলোকে লম্বা লম্বা করে পড়তেন মাত্র। ১১ রাকাতের অতিরিক্ত পড়তেন না। (উমদাতুল কারী-৩, পৃঃ ৬২৮)।

আল্লামা বদরুদ্দীন আয়েনীর মন্তব্য থেকে আরও পরিষ্কার হয়ে গেল যে, অন্য মাসের তাহাজ্জুদ ও রমযানের তারাবীহ একই অনুষ্ঠানের পৃথক পৃথক নাম মাত্র।

উক্ত হাদীসটি আরও পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে এই হাদীসটির দ্বারা। ইবনে হিব্বান ও ইবনে খুযায়মা হযরত জাবেরের প্রমুখাৎ রেওয়ায়েত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (দঃ) আমাদেরকে রমযানে ৮ রাকাত তারাবীহ পড়ালেন, তারপর বেতের পড়ালেন। (ফতহুল বারী-৩, পৃঃ ৮)।

হাফেজ ইবনে হাজর এই হাদীসকে সহীহ বলেছেন। হানাফী মাযহাবের বিখ্যাত আলেম আল্লামা জয়লয়ী হেদায়ার তখরীজ গ্রন্থে ইবনে হিব্বানেরও বরাত দিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) সাহাবাগণকে রমযানে ৮ রাকাত তারাবীহ এবং বেতের পড়ালেন। (নসবুর রায়া-১, পৃঃ ২৯৩)। ইমাম জহবী এই হাদীসকে উত্তম বলে অভিহিত করেছেন।

(মিজানুল এতেদাল-৩, পৃঃ ২৮৩)।

ইমাম মোহাম্মদ ইবনে নসর, হযরত জাবেরের প্রমুখাৎ রেওয়াযেত করেছেন যে, একদিন রমযানে উবাই ইবনে কাব রসূলুল্লাহর (দঃ) নিকট হাজির হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূর (দঃ), আজ রাতে এক ঘটনা ঘটেছে। আল্লাহর রাসূর (দঃ) জিজ্ঞেস করলেন, কি ঘটনা? উবাই বললেন, আমার বাড়ির মেয়েরা আমাকে বললো, আমরা কুরআনের বিদ্যায় পারদর্শী নই, আমরা আপনার পেছনে নৈশ নামায পড়বো। আমি তাদের কথার

http://islaminonesite.wordpress.com

সূত্রে তাদেরকে ৮ রাকাত তারাবীহ এবং বেতের পড়িয়ে দিয়েছি। এ কথা শুনে আল্লাহর রসূল (দঃ) মৌন সম্মতি জ্ঞাপন করলেন।

(কিয়ামুল লায়েল, পৃঃ ৯০)।

৮ রাকাত তারাবীহ সম্পর্কে যে কয়টি হাদীস উল্লেখ করলাম, কোন হাদীস দুর্বল বা জঈফ নয়। আলেম সাহেব তার রেসালায় বলেছেন, ৮ রাকাত নামাযের হাদীসগুলোতে তারাবীহ শব্দের উল্লেখ না থাকায় ৮ রাকাত তারাবীর দলিল বাতিল এবং তিনি একথাও বলেছেন, তারাবীহ শব্দ দেখিয়ে দিতে পারলে এক লাখ টাকা পুরস্কার দিবেন। এই পুরস্কারের কথা শুনেই তো চমকে গেলাম। কারণ এক ব্যক্তি বলেছিল, আমাকে যে বুঝাতে পারে যথা সর্বস্ব তাকে দিব। এ কথা শুনে তার স্ত্রী বলেছিল, একি কথা বলছো? কেউ যদি তোমাকে বুঝাতে পারে তাহলে যথা সর্বস্ব তাকে দিবে নাকি? তখন সে বলেছিল, আমি বুঝলে তো। যতোই আমাকে বুঝাক শেষে বলবো– উহু, কিছুই বুঝলাম না। বলাবাহুল্য, আলেম সাহেব সম্বন্ধেও আমাদের ঐ আশংকাই হচ্ছে। তা না হলে রসূলুল্লাহ (দঃ) থেকে ৮ রাকাত তারাবীর যে কয়টি হাদীস উল্লেখ) করা হলো এবং উক্ত হাদীসগুলো সম্পর্কে হানাফী মাযহাবের বিখ্যাত আলেম আল্লামা বদরুদ্দীন আয়েনী, আল্লামা জয়লয়ী এবং হাফেজ ইবনে হাজর, ইমাম জহবী, হাফেজ সৈয়ুতী প্রভৃতি মহা বিদ্বানগণ যেসব মন্তব্য করেছন, এগুলো পাঠ করার পর তাঁর গোলক ধাঁ ধা ছুটে যাওয়া উচিত। তারপর আলেম সাহেব ২০ রাকাত তারাবীর সমর্থনে যেসব দুর্বল দলিল পেশ করেছেন, সেখানেও যে 'এশরিনা রাকাআতান' শব্দ আছে, তারাবীহ শব্দ নেই, এ কথা কি তিনি ভেবে দেখেছেন? তাঁর জেনে রাখা উচিত, এক যাত্রায় পৃথক ফল ফলতে পারে না। এবং তার আরও জানা উচিত, রমযানে 'কিয়ামুল লায়েল'-কেও তারাবীহ বলা হয় এবং তাহাজ্জুদ ও তারাবীহ একই অনুষ্ঠানের ভিন্ন ভিন্ন নাম মাত্র। আর তার সংখ্যা হচ্ছে বেতের সহ এগারো রাকাত। একথা হযরত জাবেরের হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়েই গেছে যে, রমযানে আল্লাহর নবী সাহাবীদেরকে ৮ রাকাত তারাবীহ ও বেতের পড়িয়েছিলেন। অতএব আলেম সাহেবের 'উহু বুঝলাম না' বললে আর চলবে না। তবে টাকা আমরা চাই না। যে মাদ্রাসায় তিনি চাকরি করেন সেই মাদ্রাসার উন্নতিকল্পে পঞ্চাশ হাজার টাকা আর উক্ত মাদ্রাসার গরিব ও মেধাবী

http://islaminonesite.wordpress.com

ছাত্রদের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা, এই মোট এক লাখ টাকা খরচ করে তিনি তার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করবেন।

যে হযরত উমরের (রাঃ) জন্য আলেম সাহেব এতো ব্যস্ত, এবার তারাবীহ সম্পর্কে সেই হযরত উমর ফারুকের কথায় আসা যাক। দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর ফারুক (রাঃ) যখন তারাবীর বিরাট জামাত কায়েম করেছিলেন, তখন তিনি উক্ত জামাতের ইমামকে বেতেরসহ ১১ রাকাত পড়ার হুকুম দিয়েছিলেন। ইমাম মালেক, সারেব ইবনে এজিদের প্রমুখাৎ বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, খাত্তাবের পুত্র উমর উবাই ইবনে কাব ও তমিমদারীকে ১১ রাকাত নামায পড়াবার আদেশ করেছিলেন। (মুআত্তা তনবীরসহ-১, পৃঃ ২০৫)।

হাফেজ সৈয়ুতী তাঁর তারাবীহ সম্পর্কিত কিতাবে ১১ রাকাতের হাদীসটি সাঈদ ইবনে মনসুরের সুনান হতে উদ্ধৃত করেছেন এবং লিখেছেন এর সনদ অত্যন্ত বিশুদ্ধ। (মাসাবীহ লাহোর, পৃঃ ১৯-২০)।

হাফেজী সৈয়ুতী লিখেছেন, আমাদের সহগামীগণের অন্যতম ইমাম জওযী ইমাম মালেকের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, তিনি বলেছেন, হযরত উমর যতো রাকাত তারাবীর উপর জনগণকে সম্মিলিত করেছিলন, আমার কাছে তারাবীর রাকাতের সেই সংখ্যাই অধিকতর প্রিয়। আর তা হচ্ছে ১১ রাকাত এবং উহাই হচ্ছে রসূলুল্লাহর (দঃ) নামায। ইমাম সাহেবকে জিজ্ঞেস করা হলো, বেতেরসহ কি এগার রাকাত? তিনি বললেন, হ্যাঁ। ইমাম সাহেব আরও বললেন, আমি জানি না এই অধিক সংখ্যক রাকাতগুলো কেমন করে আবিষ্কৃত হয়েছে।

হযরত উমর (রাঃ) থেকে বেতের সহ ১১ রাকাত তারাবীর যে বলিষ্ঠ প্রমাণ পাওয়া গেল তারপর আর আলেম সাহেবের ব্যস্ত হওয়া উচিত না। তবু আমরা একথা বলবো, তারাবীহ সম্পর্কে এ পর্যন্ত যা আলোচনা করা হলো, তাতে বুঝা গেল প্রথম থেকেই বিদ্বানগণের মধ্যে তারাবীর রাকাত সংখ্যা নিয়ে মতভেদ চলে আসছে। তাবেয়ীন ও অনুসরণীয় ইমামগণও এ বিষয়ে একমত হতে পারেননি। কিন্তু মতভেদ যতই থাক, আল্লাহর রাসূল (দঃ) এবং সাহাবায়ে কেরামের উক্তি ও আচরণ থেকেই বেতেরসহ ১১ রাকাত তারাবীহ পড়ার দলিল বলিষ্ঠ ও নির্ভরযোগ্য প্রমাণিত হয়েছে।

http://islaminonesite.wordpress.com

অতএব আল্লাহর রসূলের সুন্নতকে অগ্রগণ্য করাই উচিত। আল্লাহর মেহেরবানীতে আহলে হাদীসরা তাই করে থাকেন। কিন্তু আলেম সাহেব কতকগুলো লোকের কাছ থেকে বাহবা নেওয়ার মানসে বা নিজের ইজ্জত রক্ষার গরজে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার পথ অবলম্বন করেছেন। আমরা তাকে অনুরোধ করবো তিনি ২০ রাকাত পড়বেন পড়ুন কিন্তু আল্লাহর রসূল ও সাহাবায়ে কেরামের উক্তি ও আচরণ থেকে বেতেরসহ যে ১১ রাকাতের দলিল বলিষ্ঠ ও নির্ভরযোগ্যভাবে প্রমাণিত, তাকে অস্বীকার করার ধৃষ্টতা তিনি যেন না দেখান, এবং 'আহলে হাদীসরা হাদীস মানে না' এরূপ মিথ্যা ও বেতমিযী কথা থেকে তিনি যেন তওবা করেন। তবুও যদি তার জিদ তিনি না ছাড়েন, তাহলে যেসব মহাবিদ্বানগণ ২০ রাকাতের বিপক্ষে ও ৮ রাকাতের সপক্ষে প্রমাণ সাপেক্ষে মন্তব্য পেশ করেছেন, তারা সকলেই যে মিথ্যাবাদী ছিলেন, একথা প্রমাণ করে দিয়ে আমাদের কাছে থেকে .৫ পয়সা বখশিশ তিনি গ্রহণ করতে পারেন।

বড় জামাতের কথা

আলেম সাহেব বড় জামাতে শামিল থাকার দলিল পেশ করেছেন এবং তার জামাত যে বড় জামাত এ কথার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। কিন্তু তার জামাতও যে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়েছে এবং এক দল আর এক দলকে যে কটাক্ষ করে গালিগালাজ করে থাকেন– একথা কি তিনি অস্বীকার করতে পারবেন। আমরা বুঝলাম না বড় জামাত বলতে যে ম্যাজরিটির জামাত, একথা তাকে বললো কে? বড় জামাত বলতে কোন্ জামাত বুঝায় এ বিষয়ে আল্লাহর নবীর একটি হাদীস ও বিদ্বানগণের কয়েকটি উক্তি তাকে আমি উপহার দিচ্ছি। আল্লাহর রসূল (দঃ) বলেছেন, ইসলামের সূচনা গরিব অবস্থায় ঘটেছে এবং সূচনায় যেমন ঘটেছিল পুনরায় সেইরূপ ঘটবে। অতএব গরীবরাই ভাগ্যবান। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল (দঃ) গরিবের তাৎপর্য কি? রসূলুল্লাহ (দঃ) বললেন, সংখ্যাগুরু খারাপ লোকের মাঝে মুষ্টিমেয় সৎলোক। অনুগত দলের চেয়ে অমান্যকারীদের সংখ্যা বেশি হবে। (মুসনাদে আহমদ-২ পৃঃ ১৭৭ ও ২২২, মুসলিম-১ পৃঃ ৮৪)।

http://islaminonesite.wordpress.com

আল্লাহর রসূলকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, হুজুর বৃহত্তম দল কারা? তিনি বললেন, আমার ও আমার সহচরগণের পরিগৃহীত রীতির যারা অনুসরণ করে, তারাই বৃহত্তম দল বা বড় জামাত। (মজমাউয যাওয়ায়েদ-৭, পৃঃ ২৫৯)।

এই হাদীস দু'টিতে ম্যাজরিটি গুরুত্ব দেয়া হয়নি বা বড় জামাত বলতে ম্যাজরিটি নয়। এই অভিমতের পোষকতায় বহু বিদ্বানের উক্তি উপস্থিত করা যেতে পারে। যেমন ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) বলেছেন, সংখ্যাধিক্যের কোন মূল্য নেই। কখনো একক যার তওফিক পায় সম্পূর্ণ দল তা পায় না। (আলমগীরি, আবদুল কাযী, ৩য় অধ্যায়, পৃঃ ২১৬ পৃঃ)।

আল্লামা সুফিয়ান সওরী বলেছেন, যিনি সুন্নতের এবং ইসলামী জামাতের অন্তর্ভুক্ত, একক হলেও তিনি বড় জামাত। (মীযানে কুবরা, পৃঃ ৬৩)।

মোহাম্মদ বিনে আসলাম তুদী বলেন, সুন্নতের অনুগামীগণের যদি একজনও অবশিষ্ট থাকে, তিনিই বড় জামাত। (ইগাছা, পৃঃ ৩৯)।

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী বলেন, বড় জামাতের অর্থ কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণকারীগণ। তারা ছাড়া যারা আছে দুনিয়াজুড়ে থাকলেও তাদের গ্রাহ্য করা হবে না।

মোট কথা, যিনি শরীয়তের প্রমাণগুলো মেনে চলবেন বড় জামাতের মধ্যে তিনিই গণ্য হবেন। আলেম সাহেব জেনে রাখুন, আল্লাহর ফজলে আহলে হাদীসরা বড় জামাতেরই পর্যায়ভুক্ত।

পরিশেষে আরজ

পরিশেষে আলেম সাহেবের কাছে আরজ করবো, শরীয়তের কোন বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা, গবেষণা, বিচারণা ও অনুশীলন করা দোষের কথা নয়। কিন্তু তাই বলে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের একটা দলের প্রতি কটাক্ষ, উপহাস ও গালাগালি করা অমার্জনীয় অপরাধ। জেনে রাখবেন, এ দেশে এক কোটি আহলে হাদীসের বাস। হানাফীদের সাথে তাঁরা এবং তাদের সাথে হানাফীরা মিলেমিশেই বাস করেন। ব্যবসা-বাণিজ্য, লেনদেন, চলাফেরা, খাওয়া-দাওয়া সব মিলেমিশেই হয়ে থাকে। সম্বন্ধ-সূত্রেও সব আবদ্ধ। হানাফীদের হাজার হাজার মেয়ে আহ্‌লে

http://islaminonesite.wordpress.com

হাদীসদের ঘরে আছে। আর আহলে হাদীসদের হাজার হাজার মেয়ে হানাফীদের ঘরে আছে। বৈবাহিক সম্বন্ধ সূত্রে সব জড়িত। এখন যদি আপনি আহলে হাদীসদেরকে 'লা-মাযহাবী' টা মাযহাবী' প্রভৃতি যা তা বলেন এবং গায়ের জোরে তাদেরকে মুসলমান থেকে খারিজ করে দেন, তাহলে আপনাদের হাজার হাজার মেয়ে যে আহলে হাদীসদের ঘরে আছে সেই মেয়েগুলোর কি গতি হবে? মেয়েদের বাপ ও ভায়েরা যদি বলে আমাদের মেয়েগুলোর কি গতি হবে বলুন। তা না হলে আপনার আর রক্ষা নেই। তাহলে আপনার জানের উপর টরেটক্কা শুরু হবে নাকি? তাই বলছিলাম, এসব ব্যাপারে বেশি বাড়াবাড়ি ভালো না।

তারপর আপনি ঈদের নামাযে তকবিরের সঠিক সংখ্যা কত? নামাযে অতিরিক্ত হাত উঠাইতে হইবে কিনা? হাত কোথায় বাঁধিবে? আমিন কিভাবে বলিবে? বেতের নামায কত রাকাত? ইমামের পিছনে মুক্তাদিগণের ফাতেহা পড়িতে হইবে কিনা? তিন তালাকে কত তালাক পড়িবে? ইত্যাদি বিষয়ে বই বের করবেন বলে বিজ্ঞপ্তি ছেড়েছেন।

খুব ভাল কথা। বই বের করুন। কিন্তু একটা কথা বলে রাখছি, ভালবাসি বলে যেন চিমটি কাটবেন না। মানে চার মাযহাবকে ভালবাসি বলে তিন মাযহাবের পিছনে যেন চিমটি কাটবেন না। কারণ যেসব বিষয় নিয়ে আপনি বই বের করতে চাচ্ছেন সেসব বিষয়ে চার মাযহাব কিন্তু একমত নয়। কাজেই এমনভাবে কলম চালাবেন যেন চার মাযহাবের প্রতি আপনার ভালবাসা অক্ষুণ্ন থাকে।

আর এক কথা আরজ করছি। আপনি একজন শিক্ষক। আপনি যদি ক্লাসে বসে কাদা ছুড়াছুড়ি করেন, আপনাদের মধ্যে যদি সংকীর্ণতা, গুঁড়ামি, একগুয়েমি ও হঠকারিতা প্রকাশ পায় তাহলে, সে প্রভাব আপনার ছাত্রদের উপর পড়তে বাধ্য। ফলে হবে কি? আপনার মতো চিমটি কাটার দ্বারা সমাজ ছেয়ে যাবে। তাই বলছিলাম এসব বাতিক ছেড়ে দিয়ে সমাজকে মৌলিক নীতির দিকে এগিয়ে নিয়ে চলুন। যেসব অনৈসলামিক ও মুশরেকানা জাহেলিয়াতের জীবাণু সমাজে প্রবেশ করেছে, সেগুলোর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ুন।

http://islaminonesite.wordpress.com